# অনুভবে ও বিশ্লেষণে পথের পাঁচালী

ড. রাকেশ জানা

পরিমল গোস্বামীকে বিভূতিভূষণ বলেছিলেন যে তিনি বাল্যাবস্থায় মাঠের কাছে, ঘাসের কাছে, নদীর কাছে, হাওয়ার কাছে গল্প করতেন —এখানেই চলতো তাঁর কথকতার মহড়া। বাল্যের এই গল্প বানোনোর প্রবণতাই তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার মূল প্রেরণা। সামারসেট মম বলেছিলেন যে মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে গল্প বলার প্রবণতা। তা এই প্রবণতার বলে-ই হয়ত ১৯২২ সালের ২৫ জানুয়ারি 'প্রবাসী'-তে বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি পড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চিঠি লিখেছিলেন বিভূতিভূষণকে, তাতে তিনি বলেছিলেন—

> 'তোমার গল্পটি বড়ই মনোরম হইয়াছে। রচনা যেমন সুললিত তেমন প্রাঞ্জল। পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। দুঃখ হয় যে শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। রুচি ও সুমার্জিত। তুমি চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সুনাম অর্জন করিতে পারিবে।'[১]

গল্প লেখক বিভূতিভূষণ যে সুনাম অর্জন করবেন তা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন আচার্য। তিনি যে ভবিষ্যতে 'পথের পাঁচালী'-কার হবেন—বিখ্যাত হয়ে উঠবেন একথা তাঁর প্রমম্ভিক গল্পের বুনটেই পরিস্কার হয়ে পড়ে। যদিও তাঁর জন্মানোর পূর্বে বিখ্যাত হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এক সন্ন্যাসী। তা যাই হোক 'পথের পাঁচালী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৩৫ থেকে আশ্বিন ১৩৩৬ (কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যা বাদে) আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীঃ। এই বইটির জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধানে নেমে গোপাল হালদার যে কথাগুলি বলেছেন তাতে উঠে এসেছে সমসাময়িক দেশ-কাল-সাহিত্যের প্রসঙ্গ। অতীত ও সমসাময়িকতাকে ছাপিয়ে তাঁর সাহিত্য কেন নতুননত্বের আস্বাদ এনে দেয় তাঁর বক্তব্যগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করলেই বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন—

> 'গল্পগুচ্ছের যুগ ছাড়িয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' যুগ পেরিয়ে যাচ্ছেন 'রামের সুমতি', বিন্দুর ছেলে'-র ভূমিকা শেষ করে শরৎচন্দ্র যখন তাঁর পল্লীসমাজের যুগের মধ্যপথে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের

পরবর্তী নিরাবরণতাবাদকে স্বাগত করে বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হলেন প্রথমে শৈলজানন্দ, পরে 'কল্লোল', 'কালি কলমের' লেখকেরা। বাস্তববাদ মানে অবশ্য নিরাবরণতাবাদ নয়। কিন্তু বাঙালী লোকের চোখ শরৎচন্দ্র - শৈলাজানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরল বাস্তবের দিকেই। রোমানস্ -এ এসেছিল তাদের অশ্রদ্ধা, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তারা সেদিন বিমুখ (অবশ্য তাঁর অর্থ রোমান্সের প্রতি বিমুখতা নয়; একটা। বর্ণচোরা রোমোনস্ - পিপাসাই ছিল তারও মূল)। কিন্তু চোখ অন্যদিকে ফিরলেও তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়নি। তাঁরা বাস্তবকে দেখেছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধার-করা ধারালো দৃষ্টিতে। তাই সেই পুঁথি-পড়া বাস্তবকে তাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় খুঁজছিলেন বাঙলাদেশের শহরে, বস্তিতে, খনির অপরিচিত অস্পষ্টতায়, —কদাচিৎ অস্পষ্ট পল্লীসমাজে। যে বাঙলায় শতকরা ৯০ ভাগ জীবন পল্লী-কেন্দ্রিত, সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তবসাহিত্য শহরকেন্দ্রিত এ প্রয়াসও নিশ্চয়ই শতকরা ততো ভাগই ছিল মূল্যহীন। কিন্তু তা মূল্যহীন হয় তাদের আরও উদ্ভট ভাবনা ও অবাস্তব চরিত্র পরিকল্পনায়। বাঙলা কথা সাহিত্যের মোড়ও বাস্তবের দিকে ঘুরতে না ঘুরতেই আবার অবাস্তবের চোরাবালিতে আটকে গেল। তার কারণ এই যে, ইংরেজ আমলের বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মূলেই ছিল না মাটি।'[২]

তাঁর মতে এই সংকট লগ্নেই 'পথের পাঁচালী'-র 'বিচিত্রা'-য় অবির্ভাব কথাসাহিত্যে সঠিক বাস্তবকে চিনিয়েছিল— পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনের সাথে একাত্মতায়। শহরে সুনীতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যা পড়ে অনুভব করেছিলেন 'পথের পাঁচালী'-র অপুর সঙ্গে 'বাঙালী শিশুর অভিন্নতা'। গোপাল হালদার যা শুনে বলেছিলেন—

> '...বাঙলার পল্লীর জন্য তাই একটা অশ্রু-সজল মমত্ববোধ nostalgia —এই কলকাতার মানুষদেরও মনে জীইয়ে আছে, আর পল্লীত্যাগী শহরমুখো শিক্ষিতের মধ্যেও রয়েছে সেই স্মৃতি। ম্যালেরিয়ার ডিপো, এই এঁদোপুকুর ও বাঁশঝাড়ের গ্রাম তা ঠিক। দলাদলি, কুড়োমি ও গোঁড়ামিতে তা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, তাও সত্য। কিন্তু আরও সত্য একটা আছে তাও বুঝতাম। 'গল্পগুচ্ছ'-র রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রলোকের ওপার থেকে তার উপরে তাঁর কবি-দৃষ্টির

কিরণরেখাটি পাত করে আমাদের তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে দেখা তবু জানতাম কাব্য-চন্দ্রিকার কাব্যজোৎস্নায় দেখা বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজননী। তাই একটা অর্ধ অবিশ্বাসও তাতে জাগ্রত থেকেই যায়। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-তে এখন আমরা সেই পল্লীপ্রকৃতিকে দেখলাম ঠিক চন্দ্রলোকের মানুষের চোখে দেখা নয়। বরং অতিপরিচিত এই বাঙলাদেশের গ্রাম থেকেই সেই গ্রাম্য পথরেখাটি চন্দ্রলোকের দিকে উঠে গিয়েছে... না, এপথ সেই পৃথিবী ছাড়া রোমান্সের পথ নয়। প্রত্যেকটি গাছ লতা আর ফুল এখানে আপনি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবিতে নাম নিয়ে উপস্থিত—কোন ফুল, কোন গাছ, কোন লতা শুধু নাম না জানা ফুল বলে, গাছ বলে, লতা বলে একাকার হয়ে যায়নি। ...প্রকৃতি বলে একটা কিছু যে আছে—আর তা আছে শুধু 'ডেজি', 'ডেফোডিল', 'প্রিমরোজ' নয়, শুধু পাহাড়ে পর্বতে সমুদ্রে—নদী সৈকতে নয়, সাঁওতাল পরগণায় বা দার্জিলিং-এও নয়—আছে তা আমাদেরই ঘরের দুয়োরে—ঝোপে ঝাড়ে বনে জঙ্গলে এঁদো পুকুরের পাশে, অ্যম্শ্যাওড়ার বনে, তেলকুচার, ঘেঁটুফুলের বিশিষ্ট গন্ধে—আমাদের এই চেতনাকে সেদিন আমাদের হয়ে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন বিভূতিভূষণ—বাঙলা পল্লীপ্রকৃতির প্রতি যে মমতা আমাদের ছিল তা এক মুহূর্তে এইখানে আত্ম উপলব্ধি করলে। আর শহরে-সভ্যতায় আমাদের কোন সৃষ্টি সার্থকতা নেই বলেই এই শহর ত্যাগী পল্লী-প্রশস্তিতে আমরা পরিতৃপ্ত লাভ করলাম আরও বেশি—হোন তিনি কলকাতার মানুষ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা কলকাতা প্রবাসী ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের নীরদ চন্দ্র চৌধুরী।'৩

আবার আধুনিক কালের সাহিত্য প্রহবণতার কথার উল্লেখ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের মৃত্যু পরবর্তী শ্রদ্ধাঞ্জলীতে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের যথাযত মূল্যায়ণ করেছেন—

'যৌথ বৈষয়িকতার সাহিত্য, সমষ্টিগত সামাজিকতার সাহিত্য আজকের দিনের রেওয়াজ, যার মধ্যে গাছকে না চিনিয়ে একেবারে বনকে চেনানোর চেষ্টা রয়েছে—সেখানে অন্তরঙ্গতার স্থান নেই, আত্মীয়তার স্থান নেই, হিসেব-নিকেসে, বিচার-বিতর্কে, পাওনাগন্ডা আদায়ের মন-কষাকষিতে সে পরিচয় কন্টকিত। মানুষের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে

> মানুষের যে আর একটি, সম্বন্ধ আছে—যার অধিকারে আনন্দের পংক্তিভোজে আকাশ-আলো-বন-মাঠ-কীট-পতঙ্গ-পক্ষী সভ্য-জংলী-ধনী-দরিদ্র একাসনে বসে বিধাতার প্রসাদলাভ করে, বিভূতিভূষণ সেই পরিচয়ের চারণ।'[৪]

এই চারণ শুধু স্মৃতিচারণ না এ স্বপ্নদর্শী, জ্ঞানপিপাসু, বৈরাগী, আত্মভোলা, ভ্রমণ পাগলের— পাথ চারণ। এই পথ-চারণে জমা পড়ে অজস্র অভিজ্ঞতা যা কল্পনার ডানায় ভর করে সাহিত্য হয়ে ওঠে।

চারণ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ জানতেন—

> 'বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্রময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক-বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যাসকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল-বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজ্‌নে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ দুঃখকে রূপ দিতে হবে।'[৫]

আবার 'পথের পাঁচালী'-র 'আম আঁটির ভেঁপু'-র চর্তুবিংশ পরিচ্ছেদে একই কথা বলেছেন—

> 'জীবন বড় মধুময় শুধু এই জন্য যে, এই মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে গড়া। হোক না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।'[৬]

আসলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রেমের অন্তরালে ছিল গরীব, নিম্নবৃত্তিজীবীদের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। এক সরল, স্বচ্ছ, অনাবিল দৃষ্টি নিয়ে তিনি এদেরকে দেখেছেন প্রবল দারিদ্র্যের মাঝখানে। কিন্তু কাহিনীতে এই দারিদ্রযাপন তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলেনি। বরঞ্চ এই দারিদ্র্যের মধ্যেও জীবনের উচ্চারিত সংগীতকে পরিবেশন করেছেন। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে তাই বলেছেন—

> 'তিনি দারিদ্র্যের ছবি দেখিয়েছেন, কিন্তু তা নিয়ে বিদ্রোহের সুর তোলেননি, বরং দারিদ্র্য তাঁর কাছে উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে।

অবিশাস্য মনে হলেও একথা সত্য। দক্ষিণ বাংলার নদীমাতৃক দেশের গ্রাম জীবনের যে পরিচয় তাঁর গল্প-উপন্যাসে পাই, তা আমাদের পরিচিত। এই অঞ্চলের গরীব মানুষের সরল দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন; কিন্তু তাঁর তুলিকায় অপরূপ রূপে দেখা দিয়েছে। এ নিসর্গ-সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। যে ব্যক্তি এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়না, তাকে তিনি হতভাগ্য বলেছেন, দারিদ্র্য-পীড়িতকে হতভাগ্য বলেন নি। চরম দুর্গতি, চিরন্তন অর্ধাহার বা অনাহার বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলিকে নীতিভ্রষ্ট বা শোষকদের বিরুদ্ধে জিঘাংসাপরায়ণ করে তোলেনি, অর্থনীতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্ররোচনা দেয়নি। একতা বিভূতিভূষণের সব উপন্যাস সম্পর্কেই প্রযোজ্য।'[৭]

আসলে বিভূতি উপন্যাসে বেশিরভাগ চরিত্রগুলি দারিদ্র্যেই মহত হয়েছে, অতিরিক্ত ভোগ বা সাচ্ছল্যেও এরা জীবনের সরল-বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যায়নি।

'পথের পাঁচালী' যখন প্রকাশিত হয় তখন এই উপন্যাস প্রসঙ্গে বলা হয় যে প্রকৃতির স্বাধীন আবহাওয়া একটি শিশু চিত্তকে কিভাবে ধীর ধীরে সংসার-সংগ্রামের উপযোগী করে তুলেছে তার বিচিত্র ইতিহাস অপরূপ ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। শিশু মনে দুর্জ্ঞেয় রহস্য ইতিপূর্বে আর কেউ এদেশে এরূপভাবে উদ্‌ঘাটিত করেন নি, বিদেশেও কেউ করেছেন কিনা তা জানা যায় না। বিদেশের এডওয়ার্ড টমসন তাঁর বইতে এই গ্রন্থ সম্পর্কে সপ্রশংস বিবৃতি দান করেছেন। আবার সকলের শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বইটি দাঁড়িয়ে আছে তার আপন সত্যের জোরে। বিভূতিভূষণের এই সত্যের জোর এসেছিল তাঁর মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতে বারবার বিচরণের মাধ্যমে। অতীতে শৈশবে বিচরণের ইতিহাসই তাঁর বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসগুলিতে ঘুরে-ফিরে এসেছে। তাই তো তিনি 'স্মৃতির রেখা'-য় সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতে ফিরে যাওয়ার আবেদন রেখেছেন ঈশ্বরের প্রতি।

তা যাই হোক এই 'পথের পাঁচালী'-র উৎপত্তি কোথায়? তা নিয়ে বিভূতিভূষণ কি বলেছেন তা শোনা যাক। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী কল্যানী দেবীকে লেখা একটি চিঠি থেকে এই তথ্যটি পাওয়া গেছে—

'...যখন...বনগাঁয়ের বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ি। বারাকপুর ছেড়ে এসে

> মায়ের জন্যে বাবার জন্যে বিশেষ করে বারাকপুরের নদীতীরে গাছপালার জন্যে আমার মন খারাপ হোত এবং পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তো। যখন আমি ভাগলপুরে কাজ করি তখনও বারাকপুরের জন্য মনে কেমন করতো, তা থেকেই বোধ হয় পথের পাঁচালীর উৎপত্তি।"[৮]

'পথের পাঁচালী' উৎপত্তির ভাবনা বনগাঁর বোর্ডিং-এ হলেও তা লেখা শুরু ভাগলপুর এস্টেটের জঙ্গলমহলে। যা বিভূতিভূষণ তথা অপুর "মুগ্ধ মনের যাত্রাপথে কাহিনী"। এই যাত্রাপথের কাহিনী তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত— 'বল্লালী বালাই', 'আম-আঁটির ভেঁপু', 'অক্রুর সংবাদ'। আমরা এই যাত্রাপথে যাওয়ার পূর্বে কাহিনীর চরিত্রের উৎস সন্ধানে আলোকপাত করব।

বিভূতিভূষণের বংশলতিকায় দেখা যায় তাঁর পূর্বপুরুষ তারিনীচরণরা দুই ভাই— তারিনী এবং কালী। তারিনীচরণের ও কালীশ্বরীর পাঁচ পুত্র (মহানন্দ, শ্যাম, রাম, মধু এবং যোগেন) আর কালীর দুই সন্তান গোলক আর মেনকা। মহানন্দ ছিলেন বিভূতিভূষণের পিতা, বিধবা মেনকা মহানন্দের সংসারেই থাকতেন।[৯] সম্ভবত তাঁরই আদলে তৈরি হয়েছে 'পথের পাঁচালী'-র ইন্দিরা ঠাকরুণ চরিত্রটি। রুশতী সেন তাঁর 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়' বইটিতে চরিত্রের উৎস ন্ধান বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়েছেন—

> 'বিভূতি জীবনের পূর্বকথা বিভূতিসাহিত্যে একাধিকবার ফিরে এসেছে। লক্ষণীয় যে জীবনের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-তে আর শেষ উপন্যাস 'ইছামতী'-তে এই পূর্বকথার অনুষঙ্গকে সবচেয়ে প্রত্যক্ষে পড়ে নেওয়া যায়। মহানন্দর কাশী যাওয়া, কাশী থেকে ফেরা তাঁর কৈশোর যৌবনের টুকরো কাহিনী এসবের অনুষঙ্গে হরিহরের বেশ খানিকটা তৈরি হয়ে যায়। 'পথের পাঁচালী'-তে হরিহর যখন তার প্রথম জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে, সেখানে বিভূতিজীবনের পূর্বকথার অর্থাৎ মহানন্দর জীবনকথার অনিবার্য ছায়া পড়ে। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে, 'আজ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। সেকালের অনেক কথা হল...গোলক চাটুয্যে ছিলেন বাবার মামাতো ভাই— পিসিমার মা ছিলেন ব্রজ চাটুয্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুয্যের মেয়ে... শ্বশুরবাড়ি ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ রাখালী পিসিমার ভাই, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল— কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে।' (তৃণাঙ্কুর বি.র ১৭৮) 'তৃণাঙ্কুর' যদি সত্যিই

লেখা শুরু হয়ে থাকে ১৯২৯-এর ১৯ জুন, তবে তো 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস তার আগেই লেখা হয়ে গেছে। যেখানে 'বল্লালী বালাই' অংশে আছে ইন্দির ঠাকুরণের স্মৃতিরোমন্থন 'নিবারণের কথা মনে হয়— নিবারণ নিবারণ! ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ! ষোল বৎসরের বালক, কি টকটকে গায়ের রং, কি চুল! ঐ যে চণ্ডীমন্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জ্বর রোগে শয্যাগত হইয়া যায় যায় হইয়াও দুই-তিনদিন রহিল। আহা, বালক সর্বদা দল জল করিত, কিন্তু ইশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন—মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুবানো হইতেছিল। নিবারণ চতুর্থদিন রাত্রে মারা গেল; মৃত্যুর একটু আগেও সেই জল জল তার মুখে বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। (বি.র ১ ১৩)

তবে কি নিশ্চিত বলা যায়, যে বিধবা জ্ঞাতিবোন মেনকা মহানন্দর সংসারে থাকতেন, কেবল তাঁকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল ইন্দির ঠাকরুন? নাকি ইন্দিরের নির্মাণে এসে জমা হল কত জানা-অজানা পিসিমার কত দুঃখ-সুখের কত খণ্ড খণ্ড আখ্যান? জীবনের সাহিত্য আর সাহিত্যের জীবন নিয়ে কোন ঢালা ছক বানিয়ে তোলার অবকাশ কি পাঠক সত্যিই পান, যদি সেই সাহিত্যের নির্মাতা হন বিভূতিভূষেণের মতো কোন স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী? এ বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করতেও বিভূতিভূষণ ভোলেন না। যেমন 'অপরাজিত'-র শেষ ফর্মার প্রুফ দেখার দিন ডায়েরিতে তিনি লেখেন, 'অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দুখানির খুব যোগ আছে- চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সঙ্গে সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে ভুল নেই— কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা ভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।' (তৃণাঙ্কুর' বি.র ২ ২০৭-০৮)। ঠিক সেই রকমই, হরিহরের খানিকটা পড়া চলে মহানন্দের অনুষঙ্গে, পুরোটা আদৌ নয়। আবার বিভূতিভূষণের পিতার কৈশোর-যৌবন, তাঁর পিতা-মাতার সংসার জীবন, বারাকপুরের বাড়িতে সন্ন্যাসীর আগমন এবং ভবিষ্যৎ বলা

যে সে দিব্যাত্মা আসবেন, এ সবই আখ্যান হিসেবে পাঠক পেয়েছেন 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'-র পরবর্তীকালে। তার আগে বিভূতিজীবনের পূর্বকথা নিয়ে কোন বাঙালিরই বা মাথা ব্যথা ছিল? হয়তো ওইসব আখ্যানে গল্প আর গল্প নয় এমন অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে বাঁধা আছে যে, তাদের একটিকে অন্য থেকে আলাদা করে নেওয়া আছে শতবর্ষের এপারে দাঁড়িয়ে প্রায় অসম্ভব।'[১০]

সেইরূপ বাস্তবের চরিত্রগুলো কাহিনীর চরিত্রগুলির থেকে কিছুটা আলাদা হলেও পুরোপুরি নয়। 'পথের পাঁচালী'-র হরিহরকে যে মহানন্দের আদলেই নির্মান করেছেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। মহানন্দের কথাকতার বৃত্তি তার 'চা' ও 'তামাক' খাওয়ার ঘনখন অস্থিরতা হরিহরের স্বভাবেও বিদ্যমান। এই দুটি নেশার বাড়বাড়ন্তে ঘরের গৃহিনী যে বিরক্তিবোধ করতেন তা বিভূতিভূষণের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে শোনা যায়। এই গল্প বিভূতিভূষণের মুখেই শোনা—

'আমাদের অবস্থা তো ভাল ছিল না, বাবা কথকতা করে যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন প্রচুর টাকা, জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন এবং সেগুলি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি বাড়ি থেকে বেরুতেন না, এমনি ছিল তাঁর স্বভাব। ...পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন...অর্থোপার্জনের প্রতি তত লক্ষ্য ছিল না, দিবারাত্রি অধ্যয়ন ও গান লিখে এবং গেয়ে কাটিয়ে দিতেন...বাবা তো ঘন ঘন তামাক সাজতেন, আর মাকে বলতেন, একটু চা করে দাও না। মা কিন্তু সহজে দিতেন না, বকতে শুরু করতেন...আহা, মা-ই বা কি করবে, বার বার চা তামাক খেলে ফুরিয়ে যাবে তো, আবার আসবে কোথা থেকে। আমাদের অবস্থা তো ভাল ছিল না বৌমা...আহা, এই সময় যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন, তাহলে যতখুশী 'তামাক' আর 'চা' খেতে পারতেন, কেউ বকত না।'[১১]

'পথের পাঁচালী'-তেও হরিহর এই বাতিকের কারণেই সর্বজয়ার কাছে বকুনি শুনতো—

'ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোমাকে আগুন দি কোথা থেকে? সুঁদরী কাঠের বন্দোবস্ত করে রেখেচো কি না একেবারে। বাঁশের চেলার আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়াবার আগুন যোগাবো?'[১২]

বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দের মতো হরিহরও সন্তানের পুস্তক পাঠের প্রীতি দেখে এই প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যেও যথাসাধ্য ভালো ভালো বই ও কাগজপত্র কিনে এনে কিংবা কোন উপায়ে যোগাড় করে পুত্রের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতো। তবে মহানন্দের সবটুকুই যে হরিহর তা নয়, কেননা মহানন্দ সপরিবারে কিছুদিন কলকাতায় বাস করেছিলেন কিন্তু হরিহর তা করেননি। হরিহর অপুকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা নিজেও কলকাতা দেখেননি।

বিভূতিভূষণের ছোট বোন ছিল মণি, যার ভালো নাম সরস্বতী। সে বিবাহের পর খুব কম দিনই বেঁচে ছিল। অনেক গবেষকদের মতে দুর্গা চরিত্রটি তার আদলে নির্মিত হতে পারে। আবার ভাগলপুরের রঘুনন্দন হলের সামনে নির্জন পথে দেখা রুক্ষ চুলের দেহাতি মেয়ে, কখনো বা বড়মামার বারান্দায় বসে তেঁতুল ছড়ায় জীবনের পরম অভীষ্ঠ লাভ করা দোহাতি বালিকাও হতে পারে। যদিও 'পথের পাঁচালী' যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন তখন নাকি দুর্গা চরিত্রটিই ছিল না। পরবর্তীকালে উপরোক্ত বর্ণিত অনুষঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল এ মেয়েকে উপন্যাসে না আনলে চলবে না। রুশতী সেন বলেছেন—

> 'বিভূতিভূষণের যাত্রাপথে দুর্গার অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া সম্ভব কখনো বারাকপুরে, কখনো ভাগলপুরে, আবার ঘরের কাছে ভাটপাড়ায়, বিভূতিভূষণের অজস্র পল্লি-ভ্রমণের পথে আর পথের প্রান্তে। দুর্গার উৎসের কোন নিশ্চিত নির্বিকল্প নির্ধারণে পাঠক যতই কোনো এক বিশেষ চরিত্রকে নির্দেশ করবেন, ততই কি পাঠকের অন্বেষণ ভ্রষ্ট হবে না সত্যসন্ধান থেকে? বিভূতি সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী'-র আগে থেকেই তো দুর্গাদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। 'পুঁইমাচা'-র ক্ষেন্তি অথবা 'উপেক্ষিতা'-র দিদি কি আসলে দুর্গাদের মরণের অথবা জীবনের আখ্যানই বলতে চায়নি? আর সেই কথনের ভিতর দিয়ে কি অনিবার্য হয়ে ওঠেনি 'পথের পাঁচালী'-র দুর্গার অকালমৃত্যু? মরণের সেই অনিবার্যতা 'পথের পাঁচালী'-র পরেও বিভূতিসাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে, যারা দুর্গা অথচ দুর্গা নয়, তাদের জীবন-মরণের, নিস্ফলতা-করুণার, নিরুদ্দেশ-নিঃশব্দের বিন্যাসে বারবার সত্যি হয়ে ওঠে। কোনো বিকল্প জীবনের প্রেরণা সেখানে জমি পায় না। এ বিকল্পহীনতায় বিভূতিভূষণ বারবার তাঁর নির্মমতাকে মমতায় ঢাকতে

চেয়েছেন। কিন্তু প্রায় ততবারই সেই মমতার অন্তরণে পড়ে নেওয়া গেছে নির্মমকে। দুর্গাকে বানিয়ে ফেলবার পরে, তাকে বানিয়ে তোলার কারণ নিয়ে যত গল্প তৈরি হয়, তাতে বোঝা যায়, যে নির্মান বিভূতিভূষণের কাছে কত যন্ত্রণার, কত মায়ার, আর কত ভালোবাসার।'[১৩]

শৈশবে যাত্রাপালায় দেখা যাত্রাদলের ছেলে ফণি বিভূতিভূষণের বাড়িতে খেতে এসেছিল, সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়, 'পথের পাঁচালী'-র অনাথ অজয়ের মতো চরিত্র। সে নাবালক বেলায় বেরিয়েছে নিজের অন্ন সংস্থান করতে। কিন্তু যাত্রাপালায় সে রাজকুমার, অপূর্ব তার গানের গলা। 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বল্লালী-বলাই' অংশ প্রসঙ্গে বলেছেন—

'গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অপুর এক দূর সম্পর্কীয়া পিসি ইন্দিরা ঠাকুরাণীর লাঞ্ছনা-দুর্গতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্বজয়ার নির্মমতা ও দুর্গার স্নেহশীলতা এই প্রসঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অধ্যায়ের সহিত মূল গ্রন্থের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ নাই—ইহা মোটামুটি অপুর পিতৃবংশের পূর্ব ইতিহাস ও যে কৌলীন্যপ্রথা বিড়ম্বিত পারিবারিক ব্যবস্থার যুগ আমাদের চোখের সামনে চিরকালের মতো অন্তর্হিত হইল তাহারই করুণ অসহায়তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। একবার মাত্র নিজ পরবর্তী জীবনের দারিদ্র-অবহেলার মাঝে সর্বজয়া ইন্দিরা ঠাকুরাণীর কথা স্মরণ করিয়া নিজ যৌবনকৃত অপরাধের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে অপু জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার দিদির মনে একটা সানন্দ বিস্ময়ের ভাব জাগাইয়াছে—কিন্তু তাহার নিজের অনুভূতি 'অর্থহীন আনন্দ-গীত ও অবোধ কলহাস্যের' অধিক অগ্রসর হয় নাই।'[১৪]

শুধু 'বল্লালী-বালাই' অক্রূর সংবাদ' কেও অনেমকে মূলগ্রন্থের সঙ্গে যোগাযোগ বর্হিভূত বলে মনে করেন। আমাদের আপত্তি এই নিয়ে। দুর্গতি অপুর চরিত্র নির্মাণে 'বল্লালী বালাই'-এর আবহাওয়ার প্রয়োজন ছিল বৈকী। বিভূতিভূষণের 'বল্লালী বালাই' অংশে নষ্টালজিয়ার মধুর সুরে দুঃখবোধ তথা দুঃখযাপন মিশে রয়েছে। পারিবারিক বন্ধন, দাম্পত্য প্রেম, অপত্যস্নেহ, সংসারের মায়াবন্ধন মোহাকুলতা তথা পরিচিত জীবনের হাসি-কান্নার মুহূর্ত অপূর্ব স্বাদ এনেছে। বিবাহ ক্ষেত্রে বল্লালী আমল ছিল নীতিবর্জিত এক অমানুষিক গা-জোয়ারি কর্মকান্ড, যাতে বলি হয় অগণিত ব্রাহ্মণ বালিকা।

এই নীতিবর্জিত সমাজ কানুনে ব্রাহ্মণদের নিতে হ'ত না কনের ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব। দয়া করে নারীকে বিবাহ করার বিনিময়ে তারা ভোগ করত অর্থ-বস্ত্র-খাদ্য-অলংকার-সর্বোপরি বিবাহিত নারীকে। বৎসরান্তে স্ত্রীদের দর্শন দিয়ে শ্বশুর গৃহের উপঢৌকন নিয়ে, স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করাই ছিল তাদের জীবনের মূল কার্নিভাল। এইসব ব্রাহ্মণ বালিকাদের এক তো কুলীন বৃদ্ধের সাথে বিবাহ দেওয়া হোত তারপর স্বামী বিয়োগ ঘটলে তাদের জীবনে আঁধার নেমে আসতো। স্বামীহারা এই ব্রাহ্মণ বালিকারা সমাজের বালাই স্বরূপ বেড়ে ওঠে গুরুত্বহীনতার আঁধারে। এদের না থাকে বাপের বাড়ির ন্যায্য অধিকার, আর না থাকে স্বামী গৃহে বাস করার দাবী। তাই তাদের ভবিষ্যৎ যাপন হয় করুনার আশ্রয়ে। ইন্দিরা ঠাকরুণ এই পুরাতন ও অতীতের যুগ সন্ধিক্ষণে নিজের অতীত আঁকড়ে থাকা 'বল্লালী বালাই' স্বরূপ। তিনি যেন এ যুগের অনাবশ্যক। নিজের বৈভবহীন জীবন ও ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে। তাঁকে সবার কাছে হাত পাততে হয়। এই চেয়ে চিন্তে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুতেই তাঁর চলে যায়। প্রবল শীতের সময় আত্মীয় রামগাঙ্গুলীর কাছে চাদর চাওয়ায়-চাদর মিললেও; বড়লোক আত্মীয় কিন্তু তার এই চেয়ে বেড়ানোকে পছন্দ করে না। তাই তাকে কথা শুনতে হয়—

> 'দ্যাখো ঠাকুরঝি, এ বাড়ি থেকে যে তুমি সাত দোর মেগে বেড়াবে তা হবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছে। ভিক্ষে মাগতে হয়, আলাদা বন্দোবস্ত করো।'[১৫]

ইন্দিরা জানে তাকে দিনের মধ্যে দশবার অনেক কথাই হজম করতে হয়। তাই সে এগুলি গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। পুরোনো একটা ছড়ায় সে নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করে—

> 'লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,/ভাত পাথরটা বুকের বল।'[১৬]

তাই অনাদর সত্ত্বেও সর্বংসহা হয়ে অপরের করুণায় বেঁচে থাকে বিধবা ইন্দিরা। এই অংশে সন্ধ্যার পর হরিহরের মেয়ে দুর্গা ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া কাঁথা পাতা বিছানায় বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসির মুখে রূপকথার গল্প শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দিরা ঠাকরুণের মুখস্থ ছিল।

> 'অল্প বয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দিরা ঠাকরুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেকদিন সে এরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই; পাছে মরিচা

পড়িয়া যায়, এইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে।'[১৭]

লৌকিক ছড়া এভাবেই পরম্পরা বাহিত হয়ে ক্ষীণ দীপ্তি নিয়ে কোন প্রকারে টিকে থাকে। পরবর্তীকালে দুর্গার জীবনচর্যায় মিশে থাকে ইন্দিরা ঠাকরুণের শেখানো ছড়াগুলি। কখনো বা মায়ের অবর্তমানের ছোট্ট খোকা অপুকে দোল দিতে গিয়ে গুণগুণিয়ে ওঠে, কখনো বা লীলা দি-র বিয়ে উপলক্ষে আনা বালুচরের শাড়ি দেখে তার মনে পড়ে ছড়াটি—

'বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই—/মোষের পেটে ময়ূর ছানা দেখে এলাম সই।'[১৮] (আম আঁটির ভেঁপু, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

আবার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে গ্রীষ্মের বারোয়ারি চড়কপূজার সময় দুর্গা আবৃত্তি করেছে—

'স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ
নামলো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি
শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—'[১৯]

এই পরিচ্ছেদেরই এক অংশে জঙ্গলে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজতে খুঁজতে মনের সুখে মাথা দুলিয়ে আবৃত্তি করে—

'হলুদ বনে বনে—/নাক-ছাবিটা হারিয়ে গেলে সুখ নেইকো মনে—'[২০]

কখনো বা অপুর সঙ্গে প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝে আটকা পড়ে আবৃত্তি করে—

'নেবুরপাতায় করমচা,/হে বৃষ্টি ধরে যা—'।[২১]

দুর্গার চারিত্রিক বিকাশে, তার প্রকৃতি বিমুগ্ধতার মূলে ইন্দিরা ঠাকরুণের প্রভাব তাই অনস্বীকার্য ইন্দিরা হরিহরের মেয়ে দুর্গার মধ্যে ফিরে পেয়েছিল মৃত কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে। এই ঘুমন্ত মাতৃত্বের জাগরণে সে হরিহর ও সর্বজয়ার সমস্ত উপেক্ষা ও অনাদরকে ভুলে জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জেগে উঠেছিল।

আলোচ্য 'বঙ্গালী বলাই' অংশে শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত বিভূতিভূষণের বক্তব্যগুলি সত্যই অতুলনীয়—

'মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে যুগে যুগে মায়ের গৌরবগাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া লওয়া হাসি, শৈশব তারল্য, চাঁদ ছানিয়া গড়া সুখ, আধ আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ঐ তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মতো নেয় না।'[১১]

তাই সন্তানের প্রতি এই বাৎসল্য, স্নেহ ভালোবাসার বিনিময়ে এমন কিছু প্রাপ্তি ঘটে যার জন্য স্নেহের অতিরেক ঘটে।

নতুন যুগের আগমনে, পুরাতনের বিদায় ধ্বনি বেজে ওঠে-কিন্তু কোথাও যেন হারিয়ে যাওয়া অতীত রোমন্থন মনের মধ্যে প্রশান্তি এনে দেয়। ইন্দিরা ঠাকরুণের মৃত্যুতে নিশ্চিন্দপুর গ্রামে সেকালের অবসান ও নতুন যুগের বার্তা আনে। সেখানে যৌথ পারিবারিক জীবনের ভাঙন তথা সম্পর্কের ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। অন্নদা রায়ের পরিবার, হরিহরের পরিবার এর শিকার হয়েছে। শরিকি বিবাদের জেরে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে ভাঙন ধরে; নীরেনকে তাই গ্রাম ছেড়ে পিতার কাছে চলে যেতে হয়। বিভূতিভূষণের বর্ণিত গ্রাম সমাজে সামন্ততন্ত্রের বাড়াবাড়ি নেই তবে কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অসাম্যের চিত্র রয়েছে। যেমন বাল্যকালে অপু পিতার সঙ্গে শিষ্য বাড়িতে মোহনভোগ খাওয়া ও বাড়িতে মায়ের হাতের তৈরি মোহভোগের তফাৎ। তাছাড়া ঐ আমডোব গ্রামেই এক গ্রাম্য বধূর বাড়িতে লুচি খাওয়ার বর্ণনায় সমকালীন গ্রাম সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্যের চিত্র রয়েছে। আবার অন্যত্র গ্রাম্য কৃষক তমরেজের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ন্যায্য দাবি নিয়ে ধনবান মহাজন অন্নদা রায় মশাইকে গোলার চাবি খুলে দিতে অনুরোধ করলে তমরেজের স্ত্রীর চরম হেনস্থা এই শ্রেণীর শোষণের রূপটির বর্ণনা পাই। তাছাড়া পরবর্তী অধ্যায়ে 'অক্রূর সংবাদ' অংশে পিতৃহীন অপুর মা সর্বজয়া যখন ধনীগৃহে দাসীবৃত্তি করেছে তখন তাকেও এইরূপ শোষণের শিকার হতে হয়— অপুও এই শোষণের হাত থেকে বাদ যায় না। তবে এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সুর এতে অনুপস্থিত।

এই 'আম আঁটির ভেঁপু' অধ্যায়ে দুর্গার অধিনায়কত্বে অপু প্রকৃতির সাথে একাত্মতা অনুভব করেছে। এখানে অপু সর্বোতভাবে দুর্গার নিয়ন্ত্রণাধীন। দুর্গা চরিত্রের যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

'দুর্গার চরিত্রে এমন একটা তীক্ষ্ণ মৌলিকতা, নির্ভীক বিচরণ-স্পৃহা,

নূতন নূতন খেলা-উদ্ভাবনের শক্তি ও সাবলম্বনপ্রিয়তা আছে, যাহাতে সে আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নিকট আর সকলে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহাকে আদর্শবাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র রূপান্তরিত করা হয় নাই। তাহার গ্রাম্য বালিকার লোভাতুরতা, আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব, এমন কি প্রলোভনের বশে চুরি করিবার প্রবৃত্তিও আছে। তথাপি তাহার এমন অদম্য প্রাণশক্তি, অফুরন্ত আহরণের ক্ষমতা আছে যাহাতে তাহার দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সে আমাদের চির-প্রিয়, শৈশব-চাপল্যের চিরন্তন প্রতীক হইয়া থাকে।'[২৩]

তবে কোথাও যেন মনে হয় দুর্গার এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি, এই চাপল্য, তীক্ষ্ণ মৌলিকতা, সাবলম্বন প্রিয়তা, প্রকৃতি মধ্যে নির্ভীক বিচরণ স্পৃহা, লোলুপতার বশে আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব এসবের পেছনে ইন্দিরা ঠাকুরণের প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে। দুর্গার সোনার সিঁদুর কৌটা চুরি ও পরবর্তীকালে অপুর সেটা কলসী থেকে খুঁজে পাওয়া, ততদিনে দুর্গা আর এ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু অপু জানতো দিদির এই চৌর্যবৃত্তির আচরণ সত্ত্বেও তার কোমল সহৃদয় দরদী প্রাণে করুণা কম ছিল না। চড়ুইভাতির দিনে যুগীর বামুনের মেয়ে বিনিকে নিয়ে একসাথে খাওয়ার সময় তার দরদী প্রাণের পরিচয় মেলে। দুর্গা দিনের বেলায় প্রকৃতি মধ্যে নির্ভীক বিচরণ করলেও সে রাত্রিবেলা ভয় পায়। তার মতো স্বাবলম্বন প্রিয় মেয়ে তখন অপরের অবলম্বন খোঁজে।

দুর্গার সঙ্গে নীরেনের বিবাহ প্রসঙ্গ উপন্যাস মধ্যে প্রেমের আবহ নির্মাণ করেছে। দুর্গার কৈশোরকালীন দশা থেকে যৌবনে পদার্পন বয়ঃসন্ধিকালীন মন কেমন করা দশাটি লেখক দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন।

'দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ির কাজ তবু তো যা হোক কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। এক-একদিন, তাহার এরকম মরে ভাব হয়; সেদিন সে কিছুতেই বাড়ির গন্ডিতে আটকাইয়া থাকিতে পারে না— কে তাহাকে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা না-গরম-না-ঠান্ডা, কেমন মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় লেবু ফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।'[২৪]

আবার আর এক অংশে সুদর্শণ পোকা দেখতে পেয়ে নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের মঙ্গল কামনার সঙ্গে নীরেনের মঙ্গল কামনা ও তার সঙ্গে নীরেনের বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছাটাও লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকট করে—

> '...সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভালো রেখো, মকে ভালো রেখো, বাবাকে ভালো রেখো, ও পাড়ার খুড়িমাকে ভালো রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল—নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমরা বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শণ, রানুর দিদির মতো বাজি-বাজনা হয়।'[২৫]

কিন্তু তার এই স্বাদ অপূর্ণই রয়ে যায় শরিকী বিবাদের জেরে নীরেনের গ্রাম পরিত্যাগে। এই অপূর্ণ বাসনা নিয়ে ম্যালেরিয়ার জ্বরে দুর্গাকে চলে যেতে হয় মৃত্যুর পরপারে। মারা যাওয়ার পূর্বে অপুকে শুনিয়ে যায় তার শেষ বাসনা—

> 'অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?'[২৬]

অপুর নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ছেড়ে কাশী গমনের দিনই তাদের দুর্গার সাথে সব বন্ধন চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

দুর্গার নেতৃত্বেই অপু দুর্গার হাত ধরেই 'অরণ্য প্রকৃতির রহস্যময় নির্জনতার' মধ্যে গিয়েছে। সেখানে নিজেরই অজান্তে অপু প্রকৃতির প্রতি একাত্মতা অনুভব করেছে। তার কল্পনাপ্রবণ মনে প্রকৃতি এক অলৌকিক রহস্যময় ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। মায়ের মুকে শোনা রূপকথা ও মহাভারতের কাহিনীর অভিনয় দ্বারা এই শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের দোকানে বিকেলবেলায় দীনু পালিত, রাজু রায় ও রাজকৃষ্ণ সান্যালের জমাটে আড্ডায় তার গল্প শোনার আকাঙ্খায় তার জীবনে ক্রমাভিব্যক্তি ঘটেছে। এখানে চন্দর হাজরার মোহর প্রাপ্তির গল্প, রেল ভ্রমণের গল্প, ফকিরে তন্ত্র-মন্ত্রের অলৌকিক গল্প তার মননে প্রভাব ফেলে, তার কল্পনার পরিসরের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। শুধু গল্প শুনে নয় এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে নানান পুস্তকপাঠের মাধ্যমে তার সাহিত্য ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেছে। যদিও বই পড়ে শকুনের ডিমের সাহায্যে আকাশপথে উড়বার দুরাকাঙ্খার কল্পনা হাস্যকর। এই কল্পনার আতিশয্যে গুরুমহাশয়ের দেওয়া শ্রুতি লিখন লিখতে লিখতে সে কল্পনার দেশগুলিতে পাড়ি দিয়েছে। আবার শহুরে শিক্ষিত যুবক নীরেনের কাছে পাঠ নিতে গিয়েও অপূর্ব মানসিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, যদিও নীরেন খুব কম দিনই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে

ছিল। পিতা হরিহরের সাথে আমডোব গ্রামে বেড়াতে যাওয়া তার দূরের দেশের প্রকৃতির সাথে নব পরিচয়ের রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতায় তার মন ক্রমশঃ দৃঢ় হয়। খেলার সময় শিশুর অভিমান ক্ষুব্ধ মনের মনঃস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় বিভূতিভূষণ অনবদ্য। এই অংশে বুড়ি বসন্ত খেলার সময় অমলা সঙ্গী হিসেবে আনাড়ী অপু অপেক্ষা দক্ষ বিশুকে নির্বাচন অপুর মনে বিক্ষুব্ধ অভিমানের সঞ্চার করে। যাত্রাদলের আবির্ভাব অপূর্বকে সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। অজয়ের সান্নিধ্যে নদীতীরে ভ্রমণ ও সংগীতের আনন্দ ধারায় তার জীবনে ভিন্ন এক মাত্রার সংযোজন করেছে। প্রকৃতির মন ব্যাকুলকরা হাতছানি, কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনেছে অপুর জীবনে। বাল্যাবস্থায় গৃহের দালানের জানালার রোয়াক দিয়ে দেখা দূরের বড় অশ্বত্থ গাছ তাকে রূপকথার জগতে নিয়ে যেতো—বড় হয়ে আর আড়াল থেকে নয় পথে পাড়ি দিয়ে একাত্ম হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে। বিভূতিভূষণ বলেছেন—

> 'এই বন তার শ্যামল নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে।'[২৭]

এই রস যে বর্ণনাতীত সৌন্দর্য, যা বহুবার বন-জঙ্গলের মধ্যে বেড়িয়েও ক্লান্তিকর নয়; এ যেন অফুরন্ত সৌন্দর্যশ্রী। যা ক্ষনে নিত্যনতুন আস্বাদ এনে দেয়। বিভূতিভূষণ অপুর চোখ দিয়ে দেখান—

> 'অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা...নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর... গুলঞ্চলতার তার টাঙানো...খেজুর ডালে ঝাঁপ...বনের দিক থেকে ঠান্ডা গন্ধ বাহির হয়...রাঙা রোদটুকু জেঠামহাশয়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবিলেবুর গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে...চক্‌চকে বাদামী রঙ-এর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখি বনকলমি ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে...তাজা মাটির গন্ধ...ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ।'[২৮]

যদিও প্রকৃতি মুগ্ধতার এই অনাবিল আনন্দ একান্তই অপুর নিজের—এ বর্ণনাতিরিক্ত আস্বাদ। আবার গঙ্গানন্দপুরে সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়িতে মানত শোধ করতে যাওয়ার পথে অপুর মনে হয় এইরকম মাটির পথ বেয়ে 'শুধুই হাঁটে— শুধুই হাঁটে'। দুর্গা'র মৃত্যুর পর অপুর কাশীযাত্রা তার জীবনে

নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ঢেউ আনে। তবে কাশীর এই নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা— গভীরতাহীন; তা নিশ্চিন্তিপুরের মতো নিবিড় নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন— '...এই আকর্ষণে পূর্ব যুগের গভীর আত্মবিস্তৃত একনিষ্ঠতার অভাব।'[২৯] কাশীযাত্রার পরপর অপুর জীবনে শৈশব অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ও শৈশোর পর্যায়ের প্রারম্ভ। এইসময়ে তাই তার মানসিক বিকাশের সঠিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করা কঠিন। তবুও তার জীবনে যে সব মুখ্য ঘটনা প্রভাব ফেলেছিল তা হল—

(i) কথক ঠাকুরের মতো অভাজন অনাদৃত ব্যক্তির প্রতি করুণা মিশ্রিত ভালোবাসা।

(ii) তার পিতার সংগীতপ্রিয়তা ও কথকতার পালা রচনা তার মনের কাব্য প্রবণতাকে গতি দান করেছে।

(iii) পিতার মৃত্যুর পর তাদের অসহায় অবস্থায় ধনীগৃহে তার মায়ের দাসীবৃত্তি গ্রহণ, দাসত্বের লাঞ্ছনা, অপমান ও প্রহার। এসব কিছুর মধ্যেও ধনী গৃহের ঐশ্বর্য আড়ম্বরের ফাঁকে বড়লোকের কন্যা লীলার সঙ্গে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি-যা 'এই মরুভূমে একমাত্র নির্ঝর প্রবাহ'।

কাশীতে বন্ধুমহলে অপু তার প্রভাব ও মর্যাদার হানি ঘটবে ভেবে মিথ্যাচার করেছে। প্রবল অর্থাভাব যে তার এই মানসিকতার পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ তা বলা যায় না; তবে একথাও ঠিক যে শিশুমহলে প্রভাব খাটানোর জন্য এই ধরনের মিথ্যাচার সবসময়েই চলে। নিশ্চিন্দিপুরে রানুর ডায়েরিতে অপুর অসমাপ্ত সাহিত্যকীর্তি কাশীতে এসে পূর্ণতা পায়। যদিও এই সাহিত্যকীর্তি হরিহর দেখে যেতে পারেননি।

'পথের পাঁচালী' হল অপুর মুগ্ধ মনের যাত্রাপথের কাহিনী। এই যাত্রাপথে অপুর মধ্যে দেখা গেছে 'উদার আসক্তিহীনতা'। এখানে যেমন নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের প্রকৃতির সঙ্গে অপুর অন্তরঙ্গতা রয়েছে। ঠিক তেমনি কাশীতে পিতার মৃত্যুর পর রুজির তাগিদে তার মায়ের দাসীবৃত্তি গ্রহণের লাঞ্ছনা অপমান, দুর্ভোগ—শহরে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে ওঠার কথাও রয়েছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে রয়েছে পথ দেবতার চরৈবেতির মন্ত্র—

> 'পথের দেবতা প্রসন্ন বলেন— মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়

কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায় তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ার পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গন্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে... দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়... তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না... চলে ... চলে... চলে... এগিয়েই চলে...।

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ...

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি!...

চল এগিয়ে যাই।[৩০]

অপুর পথের এই সদা চঞ্চল অগ্রগমনশীলতা তাকে সব বিষয়ে মুক্ত-উদার-আসক্তিহীন করেছে। পরবর্তী উপন্যাস 'অপরাজিত' (১৯৩২) দুইখণ্ড-তেও অপুর জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা তাকে মোহাকুল ও মায়ার বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সব গন্ডি ও বাঁধন ছাড়িয়ে তার স্বভাব সরল মুক্ত মন পথের দেবতার আহ্বান ভোলেনি।

তথ্যসূত্র


১. রুশতী সেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৯। পৃ.-১৬৯।

২. গোপাল হালদার। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৫৭। কলকাতা। পৃ.-৪৭-৫০।

৩. তদেব। পৃ.-৪৭-৫০।

৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা। ৩ নভেম্বর ১৯৫০।

৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যের কথা। বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৮৮, পৃ.-২৬১।

৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড। পথের পাঁচালী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা। জানুয়ারি ২০০৫, তৃতীয় মুদ্রণ,

শ্রাবণ ১৪১৭। পৃ.-১০০।
৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। কালের প্রতিমা (বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর ১৯৩২-১৯৯৭)। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। এপ্রিল ১৯৭৪, পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০১০। পৃ.-৫৪, ৫৫।
৮. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। বিভূতিভূষণ রচনাবলী ১০ম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯, ১৩৯৯। পৃ.-৩৫৭।
৯. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৬ ক্রোড়পত্র ১, পৃ.-৪৮।
১০. রুশতী সেন। বিভূতিষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ.-১৩৪, ১৩৫।
১১. যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'উপল-ব্যথিত-গতি'। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭১, ১৯৭৬। পৃ.-১৬।
১২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড। পথের পাঁচালী। পৃ.-৪০।
১৩. রুশতী সেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ.-১৮৩।
১৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮। পুনমুদ্রণ সংস্করণ ২০১১-২০১২। পৃ.-৩২৮।
১৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড। পথের পাঁচালী। পৃ.-১৫।
১৬. তদেব। পৃ.-১৫।
১৭. তদেব। পৃ.-৫, ৬।
১৮. তদেব। পৃ.-৮৩।
১৯. তদেব। পৃ.-৯৩।
২০. তদেব। পৃ.-৯৬।
২১. তদেব। পৃ.-৪২।
২২. তদেব। পৃ.-১১।
২৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। পৃ.-৩২৮।
২৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড। পথের পাঁচালী। পৃ.-৮০।
২৫. তদেব। পৃ.-৮০।
২৬. তদেব। পৃ.-১৩৪।
২৭. তদেব। পৃ.-৬৫।
২৮. তদেব। পৃ.-৬৭।
২৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। পৃ.-৩২৮।
৩০. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড। পথের পাঁচালী। পৃ.-১৬৭।